বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ■ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আজ ১৭ মার্চ, বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালার আয়োজনেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে করোনা। তাই জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে উদযাপনের লক্ষ্যে সরকার 'মুজিববর্ষ'র সময়সীমা ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। জন্মশতবার্ষিকীর এই বর্ণাঢ্য আয়োজন যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে উদযাপনের জন্য আমি দেশবাসী ও প্রবাসী সকল বাঙালির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী'র সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৮ সালে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', '৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এরপর দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রহসনমূলকভাবে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা"। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মিত্রবাহিনী সদস্যদের প্রত্যাবর্তন, স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষি বিপ্লব, কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণসহ দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি।

রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়াচীন' সহ তাঁর জীবন ও কর্মের উপর দেশি-বিদেশি খ্যাতিমান লেখকদের রচিত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ পাঠ করে তরুণ প্রজন্ম আগামীতে জাতিগঠনে যথাযথ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। তাঁর দেখানো পথেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সফলভাবে করোনা মোকাবিলা করে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার। তাঁর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব- এ প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মহামানবের জন্মজয়ন্তীতে
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ

আবেদ খান

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় কীভাবে তাঁর জন্মদিন পালন করেছেন তার একটি বর্ণনা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'কারাগারের রোজনামচা' স্মৃতিকথার একাংশে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি ছিল ১৯৬৭ সালের ১৭ মার্চ। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই। বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটা উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধ হয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস! দেখে হাসলাম'।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আগে যখন সেই উত্তাল মার্চের সময়ে বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ব্যস্ত সময় চলছিলো, সে সময় ৩২ নম্বর ছিলো দেশি-বিদেশি সব সাংবাদিক সমেত সমস্ত মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রস্থল। বঙ্গবন্ধু নিঃশ্বাস ফেলার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিলেন না। নেতা-কর্মী, স্থানীয়-বিদেশি সাংবাদিক সব মিলিয়ে তাঁর অতিশয় ব্যস্ত সময় যাচ্ছে। এমনই এক ব্যস্ততার মধ্যে বিদেশি এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, এই পরিস্থিতিতে আপনি আপনার এবারের জন্মদিনটি কিভাবে পালন করতে যাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার জন্মদিন পালন করি না। যে জাতি অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটায়, কথায় কথায় গুলি করে হত্যা করা হয়, সে জাতির নেতা হিসেবে আমি জন্মদিন পালন করতে পারি না'।

আমরা আজ ইতিহাসের কোনো চরিত্রের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো না। আমরা এমন একটি মানুষের কথা বলবো যিনি ইতিহাসকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আমরা এমনই একজন মানুষের কথাই এখানে তুলে আনবো, যিনি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের সন্ধান দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে সমস্ত অনাচার-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি জাতিসত্তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এ অঞ্চলের মানুষ যে ভাষায় কথা বলতো তা তাদের মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষাকে তিনি আত্মপরিচয়ের ভাষায় পরিণত করার অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা তিনি এই জাতিকে একটি ভৌগোলিক ঠিকানা দিয়েছেন। সার্বভৌমত্বের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। পৃথিবীর মানুষকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে এটা এমন একটি জাতিরাষ্ট্র যা কারও অনুগ্রহের ভেতর দিয়ে তৈরি হয়নি। নিজস্ব শক্তিতে, নিজস্ব ক্ষমতায়, অনেক রক্ত-ঘাম এবং ত্যাগের বিনিময়ে তার নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছে। সমগ্র পৃথিবীতে বাঙালির সংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটির মতো। তারা বিভিন্ন দেশের নাগরিক হতে পারে। কিন্তু তার গৌরবের বিষয়টা হলো সে নির্দ্বিধায় দাবি করতে পারে যে তার ঠিকানা বাংলাদেশ। কারণ বাঙালির একটা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে, নিজের পরিচয় আছে, নিজের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে – যা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কীর্তিতে। তিনি এমনই একটি দেশ উপহার দিয়েছেন পৃথিবীকে, যেই পৃথিবীর প্রতিটি বাঙালি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করতে পারে – আমার একটি দেশ আছে, যে দেশের নাম বাংলাদেশ।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে দীর্ঘ সময় এই মানুষটিকে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো। এই পাপ সংঘটিত হয়েছে সুদীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। তখন এই মহামানবের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করার সুযোগ ছিলো না। তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে ব্রাত্য হিসেবে চিত্রিত করা হতো।

কিছু মানুষ থাকেন যারা ইতিহাসে উদ্ধৃত হন, কেউ আছেন যারা ইতিহাসের অংশ হয়ে যান আর এমন সামান্য কয়েকজন আছেন, যাঁরা নিজেরাই ইতিহাসের স্রষ্টা হয়ে যান। বঙ্গবন্ধু এই শেষোক্ত পর্যায়েরই মানুষ। যাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে ইতিহাস, সৃষ্টি হয়েছে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের একটি বিশাল জাতির জন্মগাঁথা। এই একটি মানুষ যাঁর কর্মজীবনের প্রতিটি স্তরে রচিত হয়েছে এক মহান মুক্তিসংগ্রামের অমর পংক্তিমালা। বাঙালির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে কখনও তার আত্মপরিচয়ের সন্ধান ছিলো না, কখনও তার আত্মপরিচয়ের ইতিহাস ছিলো না। এই মহান মানুষটি এই জাতির অপ্রাপ্তির যাতনার অবসান ঘটিয়েছেন। এখন বাঙালি জাতির একটা ঠিকানা আছে, একটা জাতীয় সংগীত আছে, একটা পতাকা আছে, একটা স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ড আছে।

বঙ্গবন্ধু যে কতখানি সাহসী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন তার দুটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তেও সেই শৈশব থেকে রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সময়ের আরও অনেক উদাহরণ আছে।

প্রথম ঘটনাটির সময়কাল ষাটের দশকের শেষার্ধ। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ হিসেবে ৬ দফা পেশ করেছেন এবং সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন মুক্তিসনদের পতাকা নিয়ে। ক্ষমতায় তখন পাকিস্তানের স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। তিনি তখন আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য সব রকম দমন নীতির কৌশল প্রয়োগ করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুকে বার বার মামলা দিয়ে, বন্দি করে নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে, কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে মাঝারি সমর্থক পর্যন্ত সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের হয়রানি। অবশেষে সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করা হলো রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হলো বঙ্গবন্ধুকে, গ্রেফতার করা হলো সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে, কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলা, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বেশ কয়েকজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকেও। সামরিক আদালতে শুরু হলো কুখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। বিচারক্ষেত্র ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। প্রতিটি অভিযুক্তকে অমানুষিক এবং লোমহর্ষক নির্যাতন করা হয়েছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। উদ্দেশ্য শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী চিহ্নিত করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া যে পাকিস্তান ভাঙার চেষ্টা যেই করবে তাকেই ঝুলতে হবে ফাঁসির দড়িতে। আইয়ুব খানের সামরিক জান্তার নিশ্চিত ধারণা ছিলো শেখ মুজিবের ৬ দফার অর্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অতএব, যেভাবেই হোক বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

সামরিক আদালতে বিচার শুরু হলো। সাক্ষী আর আসামিদের আনা হলো সামরিক এজলাসে। মুহূর্তেই ঘটে গেলো নাটকীয় ঘটনা। যেসব আসামিকে রাজসাক্ষী বানানো হয়েছিলো তারা একে একে আদালতে বলতে শুরু করলেন তাদের ওপর কী ধরনের অমানুষিক নির্যাতন হয়েছে রাজসাক্ষী হবার জন্যে। হতচকিত সামরিক আদালত একের পর এক রাজসাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করতে শুরু করলো। মামলার এক নম্বর আসামি শেখ মুজিবকে কাঠগড়ায় একটা কাঠের চেয়ার দেওয়া হয়েছিলো বসার জন্য। অনতিদূরে প্রেসবক্স। সেখানে 'দৈনিক আজাদ'-এর রিপোর্টার হিসেবে উপস্থিত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, কোনোভাবেই আসামিদের সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বলতে পারবে না। তেমনটি ঘটলে কঠোর শাস্তি। শেখ মুজিব সামরিক আদালতের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হাস্যপরিহাসরত মুঠোবন্দি তাঁর বিখ্যাত পাইপ। এমন সময় তাঁর চোখ পড়লো তাঁরই অত্যন্ত প্রিয়ভাজন সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের দিকে। তিনি উচ্চস্বরে ডাকলেন, 'ফয়েজ, এই ফয়েজ'। ফয়েজ আহমদ সামরিক নির্দেশনামা মেনে ঘাড় নিচু করে আসনে বসে রইলেন। সামরিক আদালতের বাঘা বাঘা কর্মকর্তাদের কুঞ্চিত ভ্রু। দুই-তিনবার

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে সকল শিশুসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবারের জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুর হৃদয় হোক রঙিন'।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আমরা এ দিনটিকে 'জাতীয় শিশু দিবস' ঘোষণা করেছি। আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শহিদদের।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অপরিসীম মমতা। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অমিত সাহসী, মানবদরদী এবং পরোপকারী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা। স্কুলে পড়ার সময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন বাংলার নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। ১৯৪৮-৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং ৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশু আইন-২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদযাপন, সুবিধাবঞ্চিত পথ শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস ভূমিতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিতা-মাতা, পরিবার ও সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ এবং সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করার জন্যে আজকের এদিনে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রত্যয়ে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শিশুদের কল্যাণে আমরা আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি। সবাই মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি। আমাদের শিশুরা আগামীর বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক; মেধা ও প্রজ্ঞায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুক; আন্তর্জাতিকভাবে গৌরব বয়ে আনুক প্রিয় মাতৃভূমির জন্য-এই কামনা করি।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা